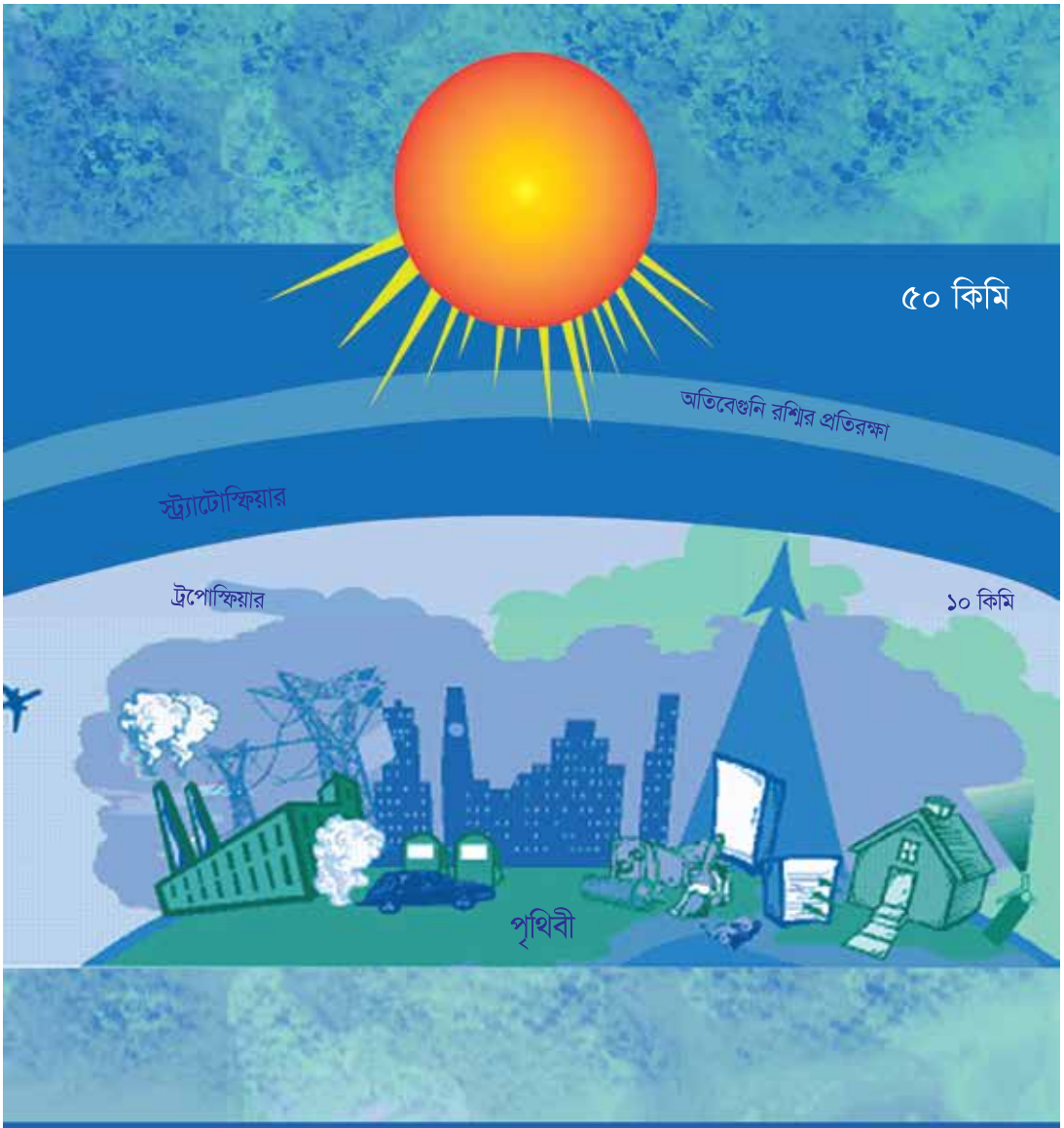

ওজোনস্তর রক্ষা
বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্যোগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

UNDP Empowered lives. Resilient nations.

UN environment

Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol

Department of Environment

ওজোনস্তর রক্ষা

বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্যোগ

প্রকাশনায়
ওজোন সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৬।

দ্বিতীয় সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০১৯

উপদেষ্টা
জনাব আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী
সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ড. এ. কে. এম. রফিক আহাম্মদ
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

সম্পাদনায়
জনাব মোঃ জিয়াউল হক
পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা) ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, ওডিএস প্রকল্পসমূহ
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ড. সত্যেন্দ্র কুমার পুরকায়স্থ
প্রকল্প সমন্বয়ক, ওডিএস প্রকল্প
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

শেখ ওবায়দুল্লাহ আল মাহ্‌মুদ
প্রকল্প কর্মকর্তা, ওডিএস প্রকল্প
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
প্রাক্তন মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
এবং
সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশমী
প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

জনাব মোঃ শাহজাহান
প্রাক্তন অতিরিক্ত মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

কম্পিউটার কম্পোজ
জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর, ওজোন সেল
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

শব্দ সংক্ষেপ

সিসিএসি	ক্লাইমেট এন্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন
সিএফসি	ক্লোরোফ্লোরোকার্বন
সিটিসি	কার্বন টেট্রাক্লোরাইড
ডিওই	ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্ট
ডিইউ	ডবসন ইউনিট
ইইউএন	এসেনশিয়াল ইউজ নমিনেশন
এক্সকম	এক্সিকিউটিভ কমিটি
জিএইচজি	গ্রিন হাউজ গ্যাস
জিডব্লিউপি	গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল
এইচসিএফসি	হাইড্রোক্লোরোফ্লোরোকার্বন
এইচএফএ	হাইড্রোফ্লোরোএলকেন
এইচপিএমপি	হাইড্রোফ্লোরোকার্বন
এইচপিএমপি	এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান
এইচবিএফসি	হাইড্রোব্রোমোফ্লোরোকার্বন
এমবিআর	মিথাইলব্রোমাইড
এমসিএফ	মিথাইক্লোরোফরম
এমডিআই	মিটার্ড ডোজ ইনহেলার
এমওইএফসিসি	মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ
এমওপি	মিটিং অব দি পার্টিস
এমপি	মন্ট্রিল প্রটোকল
এমএলএফ	মাল্টিলেটারেল ফান্ড
এমটি	মেট্রিক টন
এনওপিপি	ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ-আউট প্ল্যান
ওডিএস	ওজোন ডিপ্লিটিং সাবস্টেনসেস
ওডিপি	ওজোন ডিপ্লিটিং পটেনশিয়াল
পিভিসি	পলিভিনাইল ক্লোরাইড
আরএসি	রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং
আরএমপি	রিফ্রিজারেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান
এসএপি	সায়েন্টিফিক এ্যাসেসমেন্ট প্যানেল
টিইএপি	টেকিনিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক এ্যাসেসমেন্ট প্যানেল
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপ্‌মেন্ট প্রোগ্রাম
ইউএন এনভায়রনমেন্ট	ইউনাইটেড নেশন্‌স এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম
ইউনিডো	ইউনাইটেড নেশন্‌স ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেশন
ইউভি-বি	আলট্রাভায়োলেট-বি (অতিবেগুনি রশ্মি)
ভিসি	ভিয়েনা কনভেনশন ফর দি প্রটেকশন অব দি ওজোন লেয়ার

মূল্যবান ওজোনস্তর

ওজোনস্তর

ওজোন এক ধরনের গ্যাস যা প্রাকৃতিকভাবে আমাদের বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত। তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সমন্বয়ে ওজোন অণু গঠিত হয়। বায়ুমণ্ডলে এ ওজোন গ্যাস দুটি স্তরে বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রায় ১০-১৬ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত ১০% ওজোন পাওয়া যায় আর বাকি ৯০% ওজোন ভূ-পৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বিদ্যমান। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের এ অংশকে সাধারণভাবে ওজোনস্তর বলে।

বায়ুমণ্ডলে ওজোন

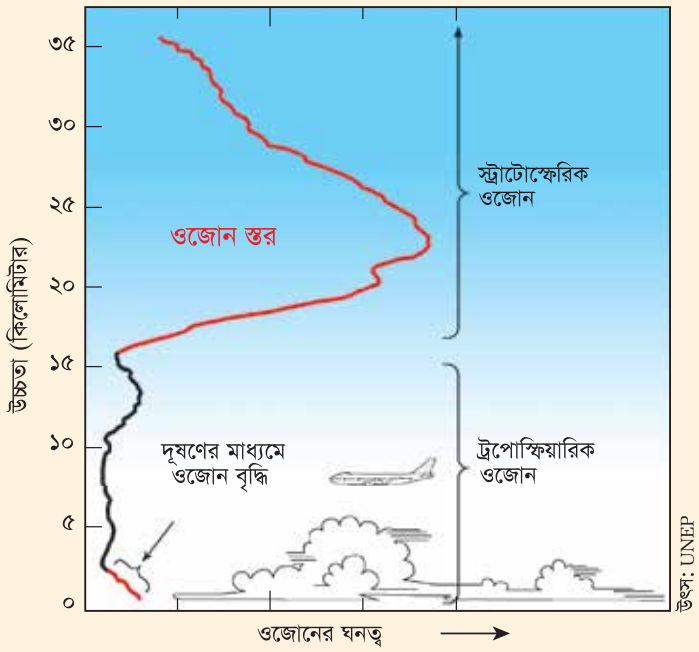

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরের ঘনত্ব মেরু অঞ্চলে বেশি এবং বিষুবীয় অঞ্চলে সবচেয়ে কম।

প্রকৃতিতে ওজোন গ্যাস সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে কয়েকটি ধাপে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে এ প্রক্রিয়া শুরু হয় সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে অক্সিজেন অণু ভেঙ্গে দুটি অক্সিজেন পরমাণু তৈরি করার মাধ্যমে। অক্সিজেনের একটি পরমাণু আবার অক্সিজেনের অন্য একটি অণুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক অণু ওজোন তৈরি করে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাস পরিমাপ করার জন্য ডবসন একক ব্যবহার (DU) করা হয়। সাধারণত বিষুবীয় অঞ্চলে এর পরিমাণ ২৬০ ডবসন একক এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে এর পরিমাণ বিষুবীয় অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন উৎপাদন

প্রথম ধাপ	ঃ O_2 + সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি $\rightarrow O + O$
দ্বিতীয় ধাপ	ঃ $2O + 2O_2 \rightarrow 2O_3$
সামগ্রিক বিক্রিয়া	ঃ $3O_2$ (সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে) $\rightarrow 2O_3$

স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন গঠন প্রক্রিয়া

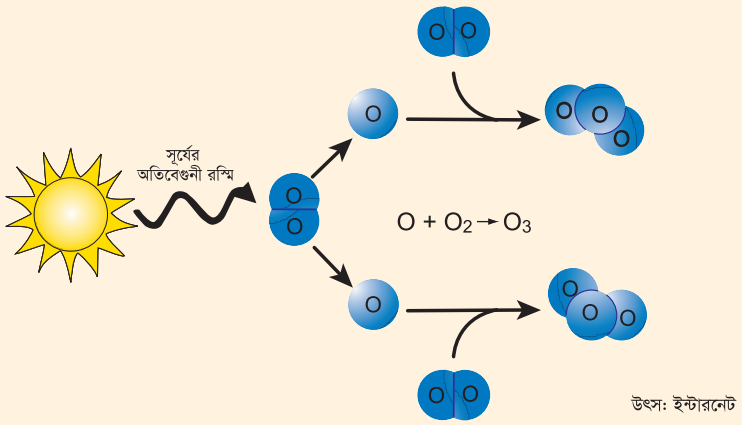

উৎস: ইন্টারনেট

ওজোন বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট বি রশ্মিকে শোষণ করে জীব জগৎকে রক্ষা করে। তাই ওজোনস্তর আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি যে ওজোন পাওয়া যায় তা দূষক এবং আমাদের জন্য ক্ষতিকর।

ওজোন গহ্বর সনাক্ত

ওজোন গ্রীষ্মমণ্ডলীর অঞ্চলে তুলনামূলক কম ঘনত্বসম্পন্ন হয় এবং ক্রমান্বয়ে মেরু অঞ্চলের দিকে বাড়তে থাকে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের যে অংশে ওজোনের ঘনত্ব ২২০ ডবসন একক হতে কম থাকে সে অংশকে সাধারণভাবে বলা হয় ওজোন গহ্বর। ১৯৫৭ সাল হতে ব্রিটিশ এন্টার্টিক সার্ভের একটি দল এন্টার্টিকার উপরে ওজোনস্তর পরিমাপ করার কাজ শুরু করে। ১৯৮৫ সালে তারা সনাক্ত করেন যে, এন্টার্টিকের উপরে ওজোনস্তরে স্পষ্ট ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তারা গবেষণা করে জানতে পারেন যে, দক্ষিণ মেরুতে বসন্তকালে এন্টার্টিকের উপরে ওজোনস্তর

ওজোন গহ্বরের মডেল চিত্র

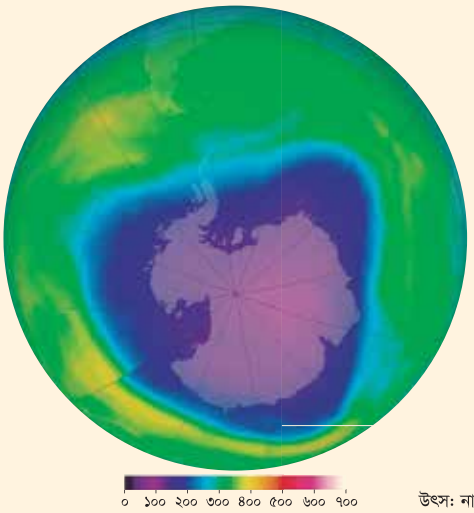

উৎস: নাসা

সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে যে ওজোন গহ্বর সৃষ্টি হয় তার আয়তন প্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তনের সমান এবং গভীরতা প্রায় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের সমান। তাদের গবেষণায় আরও বেরিয়ে আসে যে, দক্ষিণ মেরুতে

১৯৭৯ সাল থেকে সর্বমোট ওজোনের ঘনত্ব প্রায় ৫০% হ্রাস পায়। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় ওজোন গহ্বরের আয়তন প্রায় ২৫ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার বা এন্টার্টিকা মহাদেশের প্রায় দ্বিগুণ।

ওজোনস্তর ক্ষয়ের কারণ

অধ্যাপক এফ এস রোল্যান্ড এবং এম মোলিনা ১৯৭৪ সালে তাদের একটি গবেষণাপত্রে প্রকাশ করেন যে, বায়ুমণ্ডলে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা সিএফসির অবিরত নিঃসরণই স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোনস্তর ক্ষয় করে। সিএফসি যেহেতু একটি নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলে এর অণু বিভাজিত হয় না, বরং তা নির্বিঘ্নে ওজোনস্তরে গিয়ে পৌঁছায়। ওজোনস্তরে সূর্যের অতিবেগুনি

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওজোনস্তর ক্ষয় প্রক্রিয়া

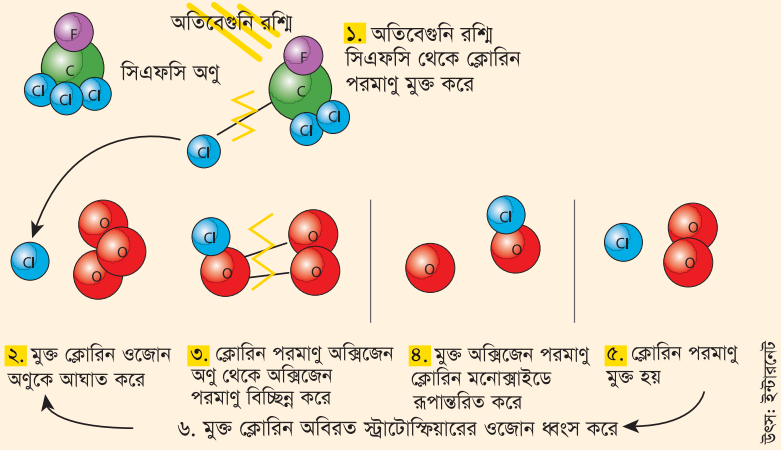

রশ্মির উপস্থিতিতে এই সিএফসি অণু ভেঙ্গে ক্লোরিন পরমাণু মুক্ত হয়। এ মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু ওজোনস্তরে ওজোন অণু বিভাজিত করার জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে ক্লোরিনের উপস্থিতিতে দুটি ওজোন অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তিনটি অক্সিজেন অণুতে রূপান্তরিত হয় এবং বিযুক্ত ক্লোরিন পরমাণু পুনরায় ওজোন অণুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এভাবে একটি সিএফসি অণু শত বছর ধরে ওজোনস্তরের মরাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে। সিএফসি অণু শত বছর ধরে ওজোনস্তরের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করতে পারে।

সিএফসি ছাড়াও অন্য যেসব রাসায়নিক ওজোনস্তরের ক্ষতি করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক হল হ্যালন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ক্লোরোফরম, মিথাইল ব্রোমাইড, এইচসিএফসি ইত্যাদি।

ওজোন ধ্বংস প্রক্রিয়া

প্রথম প্রকার : $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$

$ClO + O \rightarrow Cl + O_2$

সামগ্রিক বিক্রিয়া : $O_3 + O \rightarrow 2O_2$

দ্বিতীয় প্রকার : $ClO + ClO \rightarrow (ClO)_2$

$(ClO)_2$ + সূর্যালোক $\rightarrow ClOO + Cl$

$ClOO \rightarrow Cl + O_2$

$2(Cl + O_3) \rightarrow 2(ClO + O_2)$

সামগ্রিক বিক্রিয়া : $2O_3 \rightarrow 3O_2$

তৃতীয় প্রকার : $ClO + BrO \rightarrow Cl + Br + O_2$

$ClO + BrO \rightarrow BrCl + O_2$

$BrCl$ + সূর্যালোক $\rightarrow Br + Cl$

$Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$

$Br + O_3 \rightarrow BrO + O_2$

সামগ্রিক বিক্রিয়া : $2O_3 \rightarrow 3O_2$

ওজোনস্তর ক্ষয়ের বিরূপ প্রভাব

পৃথিবীতে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রাতিরিক্ত আপতনের কারণে মানুষের স্বাস্থ্য, জীবজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, অনুজীব, জড় পদার্থ, বায়ুমান, ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রাতিরিক্ত আপতন মানুষের ত্বকে ক্যান্সার, চোখে ছানি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, ইত্যাদি ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে শ্বেতবর্ণের মানুষের ত্বকের ক্যান্সারের জন্য অতিবেগুনি রশ্মি দায়ী। পারে যদি শিশুকালে অতিবেগুনি রশ্মি মানব দেহে দীর্ঘসময় যাবৎ পড়ে। এই ধরনের ক্ষতি জীবজগতেও লক্ষ্য করা যায়। তবে ত্বকের ব্যাপারের ঝুঁকি আরো বেড়ে যেতে পারে।

সামুদ্রিক প্রাণিকূলও অতিবেগুনি রশ্মির কারণে হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। সে অবস্থায় মানুষের প্রোটিন ঘাটতি প্রকট হয়ে উঠবে। কারণ ৩০% প্রোটিনের যোগান দেয় সামুদ্রিক প্রাণী। অতিবেগুনি রশ্মির কারণে চিংড়ি, কাঁকড়াসহ নানা প্রজাতির মাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এটি সামুদ্রিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও জুয়োপ্ল্যাঙ্কটন বৃদ্ধিতেও বাধা দান করে ফলে সামুদ্রিক প্রাণীর খাদ্যশৃঙ্খল পুরোপুরি ভেঙে পড়তে পারে।

ওজোনস্তর ক্ষয়ের পরিণতি

উৎস: ইন্টারনেট

অতিবেগুনি রশ্মি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতেও বাধা দান করে। ফলে শস্যের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা জানি, গাছ পালা ও বনাঞ্চল বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। যদি গাছপালা ও বনাঞ্চল হ্রাস পায় তবে বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বনডাইঅক্সাইড বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ত্বরান্বিত করে।

তাছাড়া দূষণের কারণে সৃষ্ট ট্রপোস্ফিয়ারের ওজোন শুধু মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে না, চোখ, ত্বক ও ফুসফুসকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি শস্য ও বিভিন্ন স্থাপনারও ক্ষতি সাধন করে।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য

ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য। সিএফসি সাধারণত রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং-এ হিমায়ক, ফোম উৎপাদনে ব্লোয়িং এজেন্ট, বিভিন্ন শিল্পে দ্রাবক ও এরোসল উৎপাদনে প্রোপেলেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এছাড়া হ্যালন, মিথাইল ব্রোমাইড, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (সিটিসি), মিথাইল ক্লোরোফরম, হাইড্রোক্লোরোফ্লোরোকার্বন (এইচসিএফসি), হাইড্রোব্রোমোফ্লোরোকার্বন (এইচবিএফসি) ইত্যাদিও ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য।

ওডিএস-এর সাধারণ ব্যবহার

উৎস: ইন্টারনেট

ওজোনস্তর ক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের মিথস্ক্রিয়া

উপরে বর্ণিত প্রায় সব ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য গ্রিনহাউজ গ্যাস; অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ওজোনক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহে উপযুক্ত বিকল্প হিসেবে প্রচলিত হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (এইচএফসি) -এর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতা (গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল) অত্যধিক বেশি হওয়ায় বৈশ্বিক উষ্ণায়নে এইচএফসি ভূমিকা পালন করে। আবার বৈশ্বিক

উষ্ণায়নের কারণে স্ট্রাটোস্ফিয়ার শীতল হয়ে পড়ে। আর স্ট্রাটোস্ফিয়ারের শীতল অবস্থা মেরু অঞ্চলে ওজোন গহ্বর সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ওজোন গহ্বর সৃষ্টি হলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে সরাসরি এসে এর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য শুধু ওজোনস্তরই ক্ষয় করে না বরং জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখে। বলা যেতে পারে, ওজোনস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হলে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়, আবার জলবায়ুর পরিবর্তন হলে ওজোনস্তরেরও ক্ষয় হয়।

ওজোনস্তর ক্ষয়ের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক

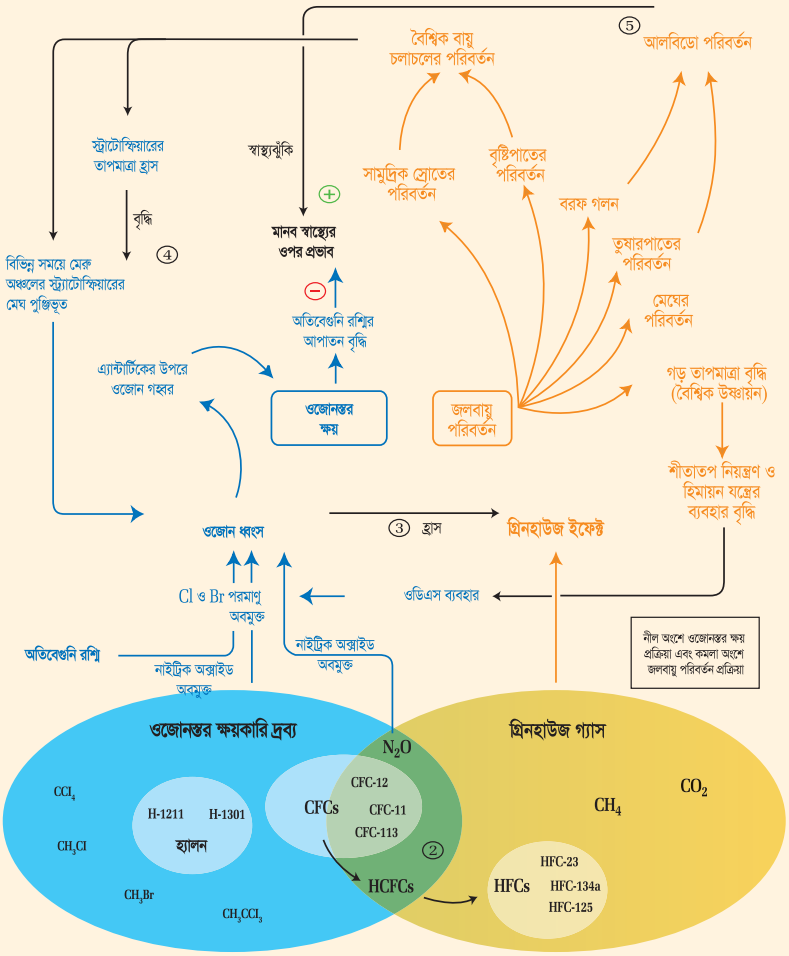

উৎস: ইন্টারনেট

ওজোনস্তর রক্ষায় ওজোন সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

ওজোনস্তর রক্ষায় ওজোন সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

ওজোনস্তরের ক্ষয় রোধ

বৈশ্বিক কার্যক্রম

ওজোনস্তর রক্ষায় ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএন এনভায়নমেন্ট) উদ্যোগে ভিয়েনায় একটি আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় ওজোনস্তর রক্ষায় ভিয়েনা কনভেনশন গৃহীত হয়। উক্ত কনভেনশনে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কোনো কর্মসূচী নেওয়া হয়নি। তবে কনভেনশনে ওজোনস্তর রক্ষায় গবেষণা ও ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও আদান-প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ অর্থে ভিয়েনা কনভেনশন ওজোনস্তর রক্ষায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ।

পরবর্তীতে ভিয়েনা কনভেনশনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয়। প্রটোকলে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মতামত এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সংশোধনের সুযোগ রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে প্রটোকলে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ৮টি দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রটোকলে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মতামতের ভিত্তিতে সমন্বয় ও সংশোধনীর সুযোগ রয়েছে।

১৯৯০ হতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মোট ৬ বার প্রটোকল সমন্বয় করা হয় এবং ১৯৯০ সালে লন্ডন, ১৯৯২ সালে কোপেনহেগেন, ১৯৯৭ সালে মন্ট্রিল ১৯৯৯ সালে বেইজিং, এবং সর্বশেষ ২০১৬ সালে কিগালি সংশোধনী গৃহীত হয়। সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ৯৬টি দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস ও বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং কিগালি সংশোধনীর মাধ্যমে প্রায় ১৮ ধরনের এইচএফসি এর ব্যবহার কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়। জাতিসংঘভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্র তথা ১৯৭টি রাষ্ট্র মন্ট্রিল প্রটোকল এবং এর (কিগালি সংশোধনী ব্যতীত) সকল সংশোধনীসমূহ অনুস্বাক্ষর করে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত প্রায় ৮১ টি রাষ্ট্র কিগালি সংশোধনী অনুস্বাক্ষর করেছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল অনুযায়ী ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সময়সীমা

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য	নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা (উন্নত দেশ)	নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা (উন্নয়নশীল দেশ)
সিএফসিসমূহ	১৯৯৬	২০১০
হ্যালনসমূহ	১৯৯৪	২০১০
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	১৯৯৬	২০১০
মিথাইল ক্লোরোফরম	১৯৯৬	২০১৫
এইচসিএফসিসমূহ	২০২০	২০৩০
এইচবিএফসিসমূহ	১৯৯৬	১৯৯৬
ব্রোমোক্লোরোমিথেন	২০০২	২০০২
মিথাইল ব্রোমাইড	২০০৫	২০১৫

ঐতিহাসিকভাবে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের অত্যধিক ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহারের ফলে ওজোনস্তর হুমকির সম্মুখীন হয়। এজন্য মন্ট্রিল প্রটোকলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উন্নত রাষ্ট্রসমূহ প্রথমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার কমিয়ে আনবে। এ ব্যাপারে উন্নয়শীল রাষ্ট্রসমূহকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সব দেশের বাৎসরিক গড় ব্যবহার ০.৩ কিলোগ্রামের নিচে সে সকল দেশ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে উন্নত দেশের তুলনায় ১০ বৎসর বেশি সময় পাবে।

১৯৯০ সালে মন্ট্রিল প্রটোকলে প্রথম সংশোধনী আনা হয়। ঐ সংশোধনীতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি কৌশল গৃহীত হয়। তাতে উন্নতরাষ্ট্রসমূহের অর্থায়নে গঠিত হয় মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ড- যার সচিবালয় মন্ট্রিলে অবস্থিত এবং একটি নির্বাহী কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। উন্নত রাষ্ট্র থেকে সাতজন এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হতে সাতজন মোট ১৪ সদস্য নিয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। নির্বাহী কমিটির সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বার্ষিক সভায় (Meeting of the Parties to the Montreal Protocol) নির্বাচিত হয়ে থাকেন। মাল্টিলেটারেল ফান্ড জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি

(ইউএনডিপি), জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউএন এনভায়রনমেন্ট), জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউনিডো) ও বিশ্ব ব্যাংকের মাধ্যমে উন্নয়শীল রাষ্ট্রসমূহকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

উন্নয়নশীল দেশের জন্য এইচসিএফসিসমূহের নিয়ন্ত্রণ সময়সীমা

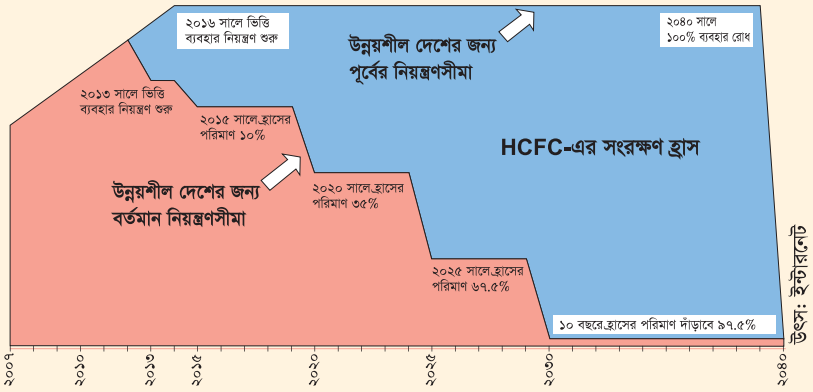

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ ২০১০ সালের মধ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পর্যায়ক্রমে ১০০% কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১ জুলাই ১৯৯৯ হতে প্রথম দফায় সিএফসি, হ্যালন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। ২০১০ সালেই মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ৯৮% ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার রোধ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বাকি ২% ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য প্রটোকলের আওতায় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যার বেশিরভাগই এইচএফসি। এই ২% কম মনে হলেও এর ব্যবহার অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এইচসিএফসির ওজোনস্তর ক্ষয়ের ক্ষমতা কম হলেও এর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই ২০০৭ সালে মন্ট্রিল সমন্বয়ের মাধ্যমে এইচসিএফসি নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা ১০ বছর এগিয়ে আনা হয়।

মন্ট্রিল প্রটোকলের আওতায় প্রায় ৪০ ধরনের এইচসিএফসি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এইচসিএফসিসমূহের ওজোনস্তর ক্ষয়ের ক্ষমতা ০.০০১ হতে ০.৫৫। এই এইচসিএফসি সব সময়ই সিএফসি, হ্যালন ইত্যাদির অন্তর্বর্তীকালীন বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হত। সিএফসির তুলনায় এটি ৫% থেকে ১০% ওজোনস্তর ক্ষয় করতে সক্ষম। এইচসিএফসি এর ব্যবহার যেমন ধারণা করা হয়েছিল তার থেকে বর্তমানে অনেক গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল এইচসিএফসি-এর বিকল্প হিসেবে হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (এইচএফসি) ব্যবহার প্রচলন করে। ২০১৬ সালের ১৫ অক্টোবর রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিল প্রটোকলের ২৮তম পার্টি সভায় কিগালি সংশোধনীটি গৃহীত হয়। এতে অধিক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন এইচএফসি এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে বর্তমান শতাব্দীর শেষে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা প্রায় ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

কিগালি সংশোধনীতে ১৮ প্রকার এইচএফসি নিয়ন্ত্রণের কথা রয়েছে। সব ক্ষেত্রে এইচএফসি বিকল্প এখনো আবিষ্কৃত না হওয়ায় সংশোধনীতে এইচএফসি-এর ব্যবহার হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার কথা বলা হয়নি। ১ জানুয়ারি ২০১৯ সাল হতে কিগালি সংশোধনী কার্যকর হয়।

কিগালি সংশোধনীতে বিভিন্ন দিক বিবেচনায় এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সদস্য দেশগুলোকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র (আর্টিক্যাল ৫ গ্রুপ) দুটি গ্রুপে বিভক্ত; গ্রুপ-১ বাংলাদেশসহ প্রায় সকল উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। গ্রুপ-২- বাইরাইন, ভারত, ইরান, ইরাক, কুয়েত, ওমান, পাকিস্তান, কাতার, সৌদিআরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। আবার উন্নত রাষ্ট্রেরও দুটি গ্রুপ রয়েছে বেলারুস, রাশিয়া, কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান একটি গ্রুপ এবং বর্ণিত উন্নত দেশগুলো বাদে অন্যান্য উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ।

সাধারণত এইচসিএফসিসমূহ গ্রিনহাউজ গ্যাস যার বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতা কার্বনডাইঅক্সাইডের তুলনায় ৫৩ থেকে ১৪৮০০ গুণ বেশি। তাই এইচসিএফসি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। আবার যে সব যন্ত্রে এইচসিএফসি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ব্যবহারের জন্য অধিক বিদ্যুৎও ব্যবহার হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। তাই এটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। দুর্ভাগ্যক্রমে এইচসিএফসি-এর অন্যতম বিকল্প এইচএফসিও গ্রিনহাউজ গ্যাস। ইতিপূর্বে ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিকল্প নির্বাচনের চেয়ে এইচসিএফসির বিকল্প নির্বাচন অনেকটাই কঠিন। তবে এইচসিএফসি-এর বিকল্প প্রযুক্তি অন্বেষণ আমাদের ওজোনবান্ধব, পরিবেশবান্ধব ও শক্তিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করার মাধ্যমে এ যাবৎ ৫ গিগা মেট্রিক টন কার্বনডাইঅক্সাইডের সমপরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নিঃসরণ এড়ানো সম্ভব হয়েছে যা ১৯৯০ সালে এই পৃথিবীতে নিঃসৃত মোট গ্রিনহাউজ গ্যাসের ২৫%। এইচসিএফসি -এর বিকল্প নির্বাচন যদি পরিবেশবান্ধব শক্তিসাশ্রয়ী হয় এবং কিগালি সংশোধনী যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তবে পৃথিবীর বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

জাতীয় কার্যক্রম

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে এবং প্রটোকলের লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং সংশোধনীসমূহ যথাক্রমে ১৯৯৪, ২০০০, ২০০১ ও ২০১০ সালে অনুমোদন করে। প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশ আর্টিকেল-৫ এর ১নং অনুচ্ছেদে তালিকাভুক্ত দেশ। প্রটোকলের শর্তানুযায়ী ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় ১৯৯৯ সালের ১ জুলাই থেকে। মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ ওডিএস সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে একটি কান্ট্রি প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় এবং ১৯৯৫ সালে সরকার পরিবেশ অধিদপ্তরে ওজোন সেল গঠন করে। ওজোন সেল ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা পালন করে আসছে।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রটোকলের নিয়ম অনুযায়ী ১৯৯৫, ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালের গড় ব্যবহারকে ভিত্তিস্তর হিসাবে নির্ধারণ করা হয় যা ১৯৯৯ সালের ১ জুলাই হতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাংলাদেশে সিএফসি-এর ভিত্তি ব্যবহার ছিল ৫৮০.৪০ ওডিপি টন। যার অর্থ হল, ১৯৯৯ সালের ১ জুলাই হতে বাংলাদেশ ৫৮০.৪০ ওডিপি টনের অধিক ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবে না এবং ক্রমান্বয়ে এর ব্যবহার কমিয়ে এনে ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে।

প্রথম কয়েক বছর বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা পুরোপুরি প্রতিপালন করা সম্ভব হয়নি। তবে ২০০২ সালে এ্যারোসল সেক্টরে "কনভারশন

টু সিএফসি ফ্রি টেকনোলজি ফর দি প্রোডাকশন অব এ্যারোসল প্রোডাক্টস এ্যাট এসিআই লিঃ" প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রটোকলের কমপ্লায়েন্ট দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে প্রায় ৫০% ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত রিফ্রিজারেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্ল্যানের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রিকাভারি ও রিসাইক্লিং প্রকল্প, কাস্টমস ট্রেনিং, টেকনিশিয়ান ট্রেনিং, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, এ প্ল্যানের আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩৮০ ওডিপি টন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করা হয়।

২০০৪ সালে সরকার 'ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪' জারি করে। এ বিধিমালার মাধ্যমে সরকার ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ শুরু করে এবং ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের অবশিষ্ট ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য সরকার ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন করে। এ প্ল্যানের আওতায় সরকার বিনিয়োগ প্রকল্প ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টর কর্মরত প্রায় ৩০০০ টেকনিশিয়ানকে "গুড সার্ভিস প্রাকটিসেস" প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া ২০০০ টেকনিশিয়ানকে রিফ্রিজারেটর রিট্রোফিট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং ওয়ার্কশপের মালিকদের মাঝে রিট্রোফিটের জন্য প্রায় ৮০০ সেট প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। নীতি নির্ধারক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রায় ৩০০ কর্মকর্তাকে "প্রমোশন অব ওজোন লেয়ার প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্ল্যানের আওতায় ২০১০ সালের ১ জানুয়ারিতে রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে ব্যবহৃত সিএফসি এবং সলভেন্ট সেক্টরে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়।

২০০৪ সালে কান্ট্রি প্রোগ্রাম হালনাগাদ করা হয়। কান্ট্রি প্রোগ্রাম হালনাগাদ করার সময় বাংলাদেশে মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) তৈরিতে সিএফসি এর ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিষয়টি জানা যায় যা ভিত্তিস্তর নির্ধারণের সময় গণনায় আনা হয়নি। বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলের পার্টি সভায় মেডিক্যাল সেক্টরে মিটার

ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) তৈরির জন্য সিএফসির ব্যবহার এসেনশিয়াল ইউজ হিসেবে অব্যহতি প্রদানের প্রস্তাব করে। মাল্টিলেটারেল ফান্ড ঔষধশিল্পে এমডিআই তৈরিতে সিএফসি ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে ২টি প্রকল্প অনুমোদন করে। এর একটির মাধ্যমে যে সব ঔষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এমডিআই প্রস্তুত করতে তাদের যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সহায়তা মাধ্যমে সিএফসি-এর বদলে এইচএফএ-তে রূপান্তর করা হয়। অন্য প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে বিকল্প প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয় এবং দেশে এ্যাজমা রোগীদের অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ইনহেলার নিরবচ্ছিন্নভাবে যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১২ সালের মধ্যে দেশ হতে ঔষধশিল্পের সিএফসি-এর ব্যবহার শতভাগ হ্রাস করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে CFC-এর ব্যবহার

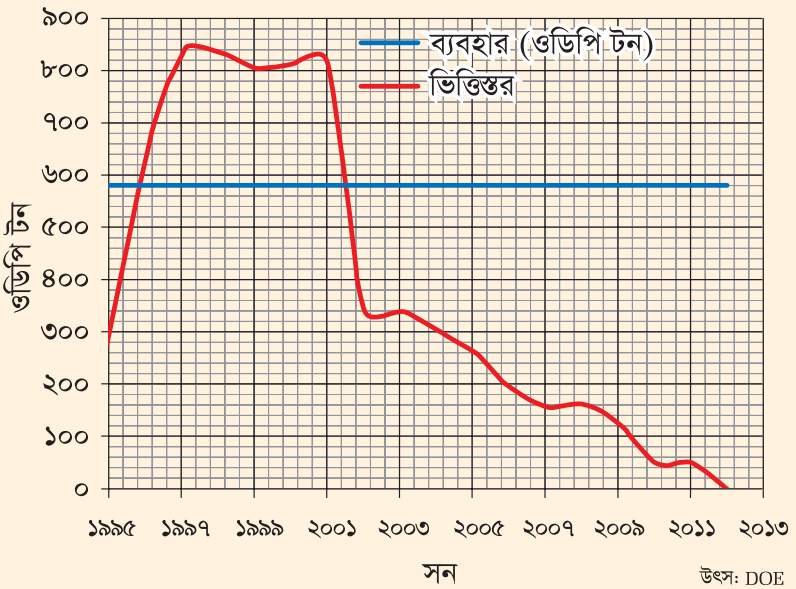

উৎস: DOE

মার্চ ২০০৫ এ ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর ফাইটোসেনিটারি মেজারর্স (আইএসপিএম-১৫) কার্যকর হওয়ার পর পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তাণীর লক্ষ্যে ব্যবহৃত কাঠের পাটাতন জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ওজোনস্তর ক্ষয়কারী মিথাইল ব্রোমাইড-এর বিকল্প উদ্ভাবনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তারই অংশ হিসাবে বেক্সিমকো গ্রুপের 'দি নিউ ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ'-এর সিইও জনাব

মোঃ হুমায়ুন কবীর কর্তৃক 'হিট ট্রিটমেন্ট'-এর মাধ্যমে কাঠজাত দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করার একটি দেশীয় পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। উক্ত 'হিট ট্রিটমেন্ট' পদ্ধতির মাধ্যমে কাঠজাত দ্রব্য জীবাণুমুক্ত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বে পাটজাতীয় দ্রব্য রপ্তানি অব্যাহত রয়েছে এবং মিথাইল ব্রোমাইড পুনর্বার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। পদ্ধতিটি আরো উন্নত করে স্বয়ংক্রিয় করা হয় এবং আন্তর্জাতিক সভায় তা প্রসংশিত হয়। ইউএন এনভায়রমেন্ট পদ্ধতিটি বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রচার করে এবং ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করে। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবিরকে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ২০১০ সালে ব্যক্তি পর্যায়ে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের HCFC-এর ফেজ-আউট সিডিউল

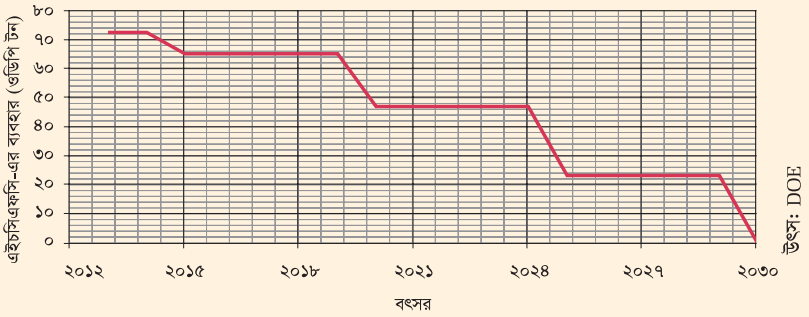

উৎস: DOE

বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল এ্যারোসল সেক্টর এবং ঔষধশিল্প হতে সিএফসি-এর ব্যবহার রোধ করা। এ্যারোসল ও ঔষধশিল্পে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এসব চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে মোকাবেলা করা সম্ভবপর হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সিএফসিসহ অন্যান্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার সফলভাবে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার জন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

ওজোনস্তর রক্ষায় সিএফসি ফেজ-আউট একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক কিন্তু সিএফসি-এর ব্যবহার কমিয়ে আনার জন্য বিশ্বব্যাপী এইচসিএফসিভিত্তিক প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়। এইচসিএফসি-এর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ক্ষমতা কম হলেও একটি একটি উচ্চমাত্রার বৈশ্বিক উষ্ণায়ক ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস। এটি মন্ট্রিল প্রটোকলের আওতায় নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটি দ্রব্য।

এইচসিএফসিসমূহ উচ্চ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় ২০০৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল সমন্বয়ের মাধ্যমে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা ১০ বছর এগিয়ে আনা হয়। আগে এইচসিএফসি ফেজ আউট করার নির্ধারিত সময় ছিল ২০৪০ সাল। মন্ট্রিল প্রটোকল সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা এগিয়ে এনে ২০৩০ সাল পূণঃনির্ধারণ করা হয়। তাই সরকার মন্ট্রিল প্রটোকল সমন্বয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪" সেপ্টেম্বর ২০১৪-তে সংশোধন করে।

২০১২ সালে HCFC-এর ব্যবহার

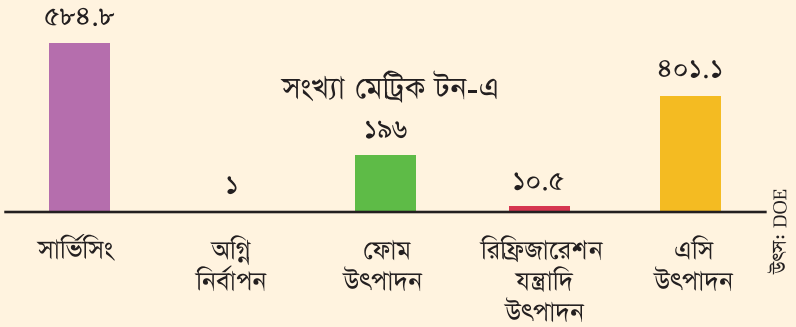

সরকার বর্তমানে এইচসিএফসির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০১১ সালে এইচসিএফসি-এর ভিত্তিস্তর নির্ধারণের জন্য ২০০৯ ও ২০১০ সালের এইচসিএফসি-এর ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণের জন্য জরিপ করা হয়। জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশে এইচসিএফসি-এর উৎপাদন হয় না। শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি করা হয়। বাংলাদেশে রিফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশনার তৈরি ও মেরামত, ফোম উৎপাদন এবং অগ্নিনির্বাপনের জন্য এইচসিএফসি ব্যবহৃত হয়। ২০১২ সালে এইচসিএফসি-২২ এর ব্যবহার ছিল ১২৭৪.৬০ মেট্রিক টন এবং এইচসিএফসি-১৪১বি এর ব্যবহার ছিল ১৭০.০০ মেট্রিক টন। জরিপের মাধ্যমে এইচসিএফসি-এর ভিত্তিস্তর ৭২.৬ ওডিপি টন নির্ধারিত হয়।

২০১১ সালে এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (এইচপিএমপি-স্টেজ-১) প্রণয়ন করা হয় এবং ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের ৬৫তম নির্বাহী কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়।

২০১২ সালে বাংলাদেশে সকল প্রকার HCFC-এর ব্যবহার (ওডিপি টন)

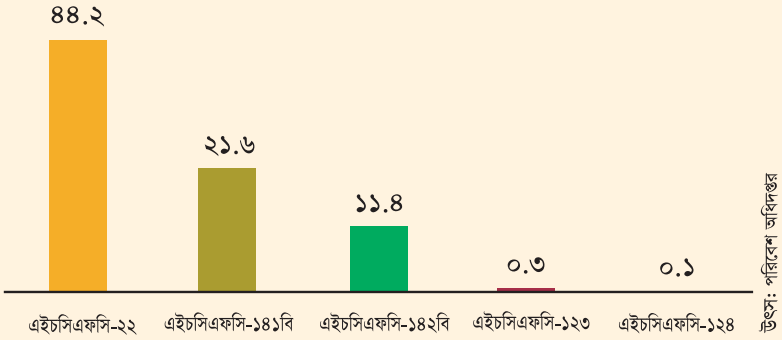

এইচপিএমপি (স্টেজ-১)-এর আওতায় রেফ্রিজারেটরে ইনস্যুলেশন ফোম প্রস্তুতিতে ফোম ব্লোয়িং এজেন্ট হিসেবে এইচসিএফসি-১৪১বি-এর ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ফোম সেক্টর হতে জানুয়ারি ২০১৩-এর মধ্যে এইচসিএফসি-১৪১বি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয়। বাংলাদেশে এখন রেফ্রিজারেটরের ইনস্যুলেশন ফোম প্রস্তুতিতে পরিবেশবান্ধব সাইক্লোপেনটেন ব্যবহৃত হচ্ছে।

এইচপিএমপি (স্টেজ-১) বাস্তবায়নের মাধ্যমে অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে এ পর্যন্ত রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে নিয়োজিত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত প্রায় ৪০০০ টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি ও ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রায় ১০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ওডিএস চোরাচালান রোধে প্রায় ৩০০ জন কাস্টমস ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কাস্টমস এন্ট্রি পয়েন্টে ওডিএস সনাক্ত ও চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, মংলা ও ঢাকার কাস্টমস হাউজে মোট ৪টি ওডিএস আইডেন্টিফায়ার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া টেকনিশিয়ানদের জন্য রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সংক্রান্ত ৫টি সহায়ক বইয়ের একটি সেট পুনঃমুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়।

ইতোমধ্যে মন্ট্রিল প্রটোকলের ২০২৫ সালের মধ্যে ৬৭.৫% কমিয়ে আনার টার্গেট রেখে মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ড এইচপিএমপি (স্টেজ-২)

অনুমোদন করেছে। এইচপিএমপি (স্টেজ-২) বাস্তবায়িত হলে ৫টি এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও একটি চিলার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে কনভারশন প্রকল্পের মাধ্যমে এইচসিএফসি-২২ এর পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে R-২৯০ এবং R-৩২ রিফ্রিজারেন্ট ব্যবহার করা হবে। এছাড়া নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাস্টমস-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, টেকনিশিয়ান ট্রেনিং, টেকসই প্রযুক্তি গ্রহণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে মন্ট্রিল প্রটোকলের একটি কমপ্লায়েন্ট দেশ এবং আশা করা যাচ্ছে অবশিষ্ট ওডিএস নিয়ন্ত্রণে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রায় ১.৭৫ মিলিয়ন টন কার্বনডাইঅক্সাইড -এর সমতুল্য নিঃসরণ হ্রাস পাবে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বর্তমানে দেশে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিকল্প হাইড্রোফ্লোরোকার্বন (এইচএফসি) এর চাহিদা বেড়ে চলেছে। এর প্রধান কারণ, নাগরিকের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিল্প কারখানাগুলো রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং এপ্লায়েন্সের জন্য বিকল্প এইচএফসির ব্যবহার। এছাড়া এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম দেশ বাংলাদেশ- ঔষধশিল্পে এমডিআই প্রস্তুতিতে এইচএফসি ব্যবহার করছে। ২০১৪ সালে ক্লাইমেট এণ্ড ক্লিন এয়ার কোয়ালিশন (সিসিএসি) এর অর্থায়নে ও ইউএনডিপি-এর সহযোগিতায় ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কী পরিমাণ এইচএফসি ব্যবহৃত হয়েছে তা জরিপের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়।

পরবর্তীতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে রিফ্রিজারেটর প্রস্তুতিতে ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রির একটি লাইনে এইচএফসি ১৩৪-এ এর পরিবর্তে হাইড্রোকার্বন R-600a ব্যবহার করে ডেমনেস্ট্রেশন প্রকল্প নেওয়া হয় যা ২০১৪তে বাস্তবায়িত হয়। কিগালি সংশোধনী গৃহীত হবার পর বাংলাদেশে কিগালি কুলিং এফিসিয়েন্সি প্রোগ্রামের সহয়াতায় একই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য লাইন কনভারসন প্রকল্পের মাধ্যমে R-600a তে রূপান্তর করা হবে এবং কমপ্রেসর কনভারসন করা হবে। প্রকল্পটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে শেষ হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রিফ্রিজারেটরে উন্নত ও শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির মাধ্যমে এইচএফসি ফেজ আউট করা সম্ভব হবে এবং প্রায় ৩ লক্ষ টন কার্বনডাইঅক্সাইড সমতুল্য নিঃসরণ হ্রাস পাবে। ফলে বাংলাদেশ কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়নে একধাপ এগিয়ে থাকবে। এছাড়া কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ন্যাশনাল কুলিং প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলছে।

সরকার এইচসিএফসি ও এইচএফসি-এর বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব, কম বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং শূন্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী ক্ষমতাসম্পন্ন ও শক্তিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণে এগিয়ে আসছে।

সরকার এ যাবৎ ওজোনস্তর রক্ষায় ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রতি বছর ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালন করা হচ্ছে। ২০১০ সালে বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শতভাগ সিএফসি, সিটিসি, মিথাইল ক্লোরোফরম বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া জানুয়ারি ২০১৩ হতে এমডিআই প্রস্তুতিতে সিএফসি ও রিফ্রিজারেটরের ইনসুলেটিং ফোম তৈরিতে ফোম ব্লোয়িং এজেন্ট হিসেবে এইচসিএফসি-১৪১বি এর ব্যবহার শতভাগ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৫ সাল হতে বাংলাদেশে মিথাইলব্রোমাইডের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে বাংলাদেশের বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ ২০১২ ও ২০১৭ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি দ্বারা বিশেষ প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। ২০১৯ সালে ওডিএস চোরাচালান রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তর প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

ওজোনস্তরকে যদি তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয় তবে মন্ট্রিল প্রটোকলের বাধ্যবাধকতাগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি ঠিক মতো পালন করা হলে চলতি শতাব্দীর মাঝামাঝি ওজোনস্তরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাই আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাকি যেসব ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রয়েছে সেগুলোর উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সেক্টরে এইচসিএফসি-এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার রহিতকরণের জন্য উন্নত বিশ্বের সঙ্গে উন্নয়শীল দেশগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে।

এইচসিএফসি উৎপাদনের সময় সৃষ্টি কিছু উপজাত বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী। তাই এইচসিএফসি-এর উৎপাদনের মাধ্যমে শুধু ওজোনস্তরই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখছে। এইচসিএফসি-এর বিকল্প এইচএফসি। যদিও এইচএফসি ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য নয় কিন্তু এটি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য প্রবলভাবে দায়ী। মন্ট্রিল প্রটোকলের পার্টিসমূহ এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় কিগালি সংশোধনী গ্রহণ করেছে। যার ফলে এইচএফসি-এর ব্যবহার হ্রাস করতে সহায়ক হবে। এইচসিএফসি ও এইচএফসি-এর বিকল্প প্রযুক্তি যদি পরিবেশবান্ধব ও শক্তিসাশ্রয়ী হয়, তবে এটি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর হবে। প্রটোকলের বাধ্যবাধকতা না থাকে সত্ত্বেও মন্ট্রিল প্রটোকলের সকল পার্টি বা সদস্য দেশ এইচসিএফসি-এর ব্যবহার কমিয়ে আনার সময় শক্তিসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বেচ্ছায়-উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মাল্টিলেটারেল ফান্ডের অবিচ্ছিন্ন সহায়তা উন্নয়শীল দেশগুলোকে কমপ্লায়েন্সে রাখতে এবং একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ও শক্তিসাশ্রয়ী প্রযুক্তি গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই উন্নত দেশগুলোর পাশপাশি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে এই ফেজ-আউট কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য অর্থায়নের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার রোধ এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রচুর চাহিদা থাকার কারণে এর অবৈধ বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল দেশের ফেজ আউট কার্যক্রম পরিপূর্ণ বাস্তাবায়নের মাধ্যমে এর অবৈধ বিপণন ও ব্যবহার রোধ করা যেতে পারে। ভোক্তার অজ্ঞতার সুযোগে পুরনো বা বাতিল প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজারজাত করা হচ্ছে। এগুলো অবশ্যই নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।

নতুন কোনো বিকল্প রাসায়নিক আবিষ্কারের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এর ভৌতিক গুণাগুণ ওজোন ও পরিবেশবান্ধব হয়। নতুন রাসায়নিক উন্মুক্ত বাজারে প্রবেশের আগেই তা নিশ্চিত হতে হবে।

আরেকটি বড় চ্যানেঞ্জ হচ্ছে কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়ন। দেখা যায়, এ পর্যন্ত বিভিন্ন সেক্টরে এইচএফসি এর বিকল্প টেকসই ও সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়নি। তবে এপর্যন্ত উদ্ভাবিত টেকসই ও সহজলভ্য প্রযুক্তি গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

নির্ঘণ্ট-১

বহুল ব্যবহৃত রিফ্রিজারেন্ট ও ব্লোয়িং এজেন্ট-এর পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য

রিফ্রিজারেন্ট/ ব্লোয়িং এজেন্ট	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	রাসায়নিক গঠন	বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতা (জিডব্লিউপি)	ওজোন ক্ষয়ের ক্ষমতা (ওডিপি)
CFC-11	ট্রাইক্লোরোফ্লোরোমিথেন	CCl_3F	৪,৭৫০	১
CFC-12	ডাইক্লোরোডাইফ্লোরোমিথেন	$CC1_2F_2$	১০,৯০০	১
R-502	ক্লোরোডাইফ্লোরোমিথেন ১-ক্লোরো ১,১,২,২,২-পেন্টাফ্লোরোইথেন	$CHClF_2$ $CClF_2CF_3$	৪,৬৫৭	০.৩৩৪০৪
HCFC-22	ক্লোরোডাইফ্লোরোমিথেন	CCl_2FCH_2	১,৮১০	০.০৫৫
HCFC-141b	১,১-ডাইক্লোরোফ্লোরোইথেন	$CHCl_2F$	৭২৫	০.১১
HFC-134a	১,১,১,২-টেট্রাফ্লোরোইথেন	CH_2FCF_3	১,৪৩০	০
R-404a	১,১,২,২,২- পেন্টাফ্লোরোইথেন ১,১,১-ট্রাইফ্লোরোইথেন ১,১,১,২-টেট্রাফ্লোরোইথেন	CHF_2CF_3 CH_3CF_3 CH_2FCF_3	৩,৯২২	০
R-407c	ডাইফ্লোরোমিথেন ১,১,২,২,২- পেন্টাফ্লোরোইথেন ১,১,১,২ টেট্রাফ্লোরোইথেন	CH_2F_2 CHF_2CF_3 CH_2FCF_3	১,৭৭৪	০
R-410a	ডাইফ্লোরোমিথেন ১,১,২,২,২- পেন্টাফ্লোরোইথেন	CH_2F_2 CHF_2CF_3	২,০৮৮	০
HFO-1234yf	২,৩,৩,৩- টেট্রাফ্লোরোপ্রোপিন	$CF_3CF=CH_2$	৪	০
HFO-1234ze	ট্রান্স-১,৩,৩,৩- টেট্রাফ্লোরোপ্রোপিন	$CF_3CH=CHF$	৬	০
N/A	সাইক্লোপেনটেন	C_5H_{10}	১১	০
HC-290	প্রোপেন	$CH_3CH_2CH_3$	১১	০
HC-600a	আইসোবিউটেন	$CH(CH_3)_2CH_3$	৩	০
R-717	এমোনিয়া	NH_3	০	০
R-744	কার্বনডাইঅক্সাইড	CO_2	১	০

উৎস: giz

নির্ঘণ্ট-২

কিগালি সংশোধনীর আওতায় নিয়ন্ত্রণযোগ্য দ্রব্য

দ্রব্যের নাম	বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতা
HFC-134	১,১০০
HFC-134a	১,৪৩০
HFC-143	৩৫৩
HFC-245fa	১,০৩০
HFC-365mfc	৭৯৪
HFC-227ea	১,২২০
HFC-236eb	১,৩৪০
HFC-236ea	১,৩৭০
HFC-236fa	৯,৮১০
HFC-245ca	৬৯৩
HFC-43-10mee	১,৬৪০
HFC-32	৬৭৫
HFC-125	৩,৫০০
HFC-143a	৪,৪৭০
HFC-41	৯২
HFC-152	৫৩
HFC-152a	১২৪
HFC-23	১৪,৮০০

নির্ঘণ্ট-৩

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ও এর বিকল্প

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য	বৈশিষ্ট্য	ব্যবহার	বিকল্প প্রযুক্তি
ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি)	দীর্ঘস্থায়ী, বিষক্রিয়া নেই, ধাতু ক্ষয়কারী বৈশিষ্ট্য নেই, দাহ্য নয়। ব্যবহার ব্যাপক। সিএফসি এর প্রকার ভেদে উন্মুক্ত পরিবেশে এদের স্থায়িত্ব ৫০ থেকে ১৭০০ বছর পর্যন্ত হয়।	হিমায়ক, দ্রাবক, এ্যারোসল প্রপেলেন্ট, ফোম উৎপাদনে ব্লোরিং এজেন্ট ইত্যাদি।	এইচসিএফসি, এইচএফসি (এইচএফসিসমূহ যদিও ওজোনস্তর ক্ষয় করে না তবে এগুলো বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী) হাইড্রোকার্বন বা এইচসি পরিবেশ বান্ধব। কিন্তু এরা বিষাক্ত হতে পারে এবং এগুলো খুবই দাহ্য পদার্থ। তাই এদের ব্যবহার এখনও সীমিত।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য	বৈশিষ্ট্য	ব্যবহার	বিকল্প প্রযুক্তি
হ্যালন	পরিবেশে এদের স্থায়িত্ব প্রায় ৬৫ বছর	অগ্নি নির্বাপক হিসেবে উড়োজাহাজে ও প্রিসিশন কক্ষে ইত্যাদি।	কার্বন ডাই অক্সাইড, নাট্রোজেন, আর্গন, এইচএফসি ইত্যাদি।
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	রংহীন অদাহ্য তরল পদার্থ।	শিল্পে দ্রাবক এবং কাঁচামাল হিসেবে।	শিল্পে দ্রাবক হিসেবে সাদা পেট্রোল, ডিটার্জেন্ট ইত্যাদি।
মিথাইল ক্লোরোফরম	বিষাক্ত, উন্মুক্ত পরিবেশে স্থায়িত্ব প্রায় ৫ বছর।	শিল্পে দ্রাবক হিসেবে, কালি ও সাদা কালি প্রস্তুতিতে।	এইচসিএফসি ২২৫ এইচসিএফসি-১৪১বি এইচসিএফসি-১২৩
মিথাইল ব্রোমাইড	উন্মুক্ত পরিবেশে এক বছরের কম স্থায়িত্ব।	পেস্টিসাইড, কোয়ারেন্টাইন ফিউমিগেশন ইত্যাদি।	সূর্যালোকে মাটি প্রস্তুত করা, হিট ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি।
হাইড্রোক্লোরোফ্লোরোকার্বন (এইচসিএফসি)	স্বল্প মাত্রার ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য কিন্তু উষ্ণায়নে এর প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে।	সিএফসি-এর অন্তবর্তীকালীন বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়, হিমায়ক, ব্লোয়িং এজেন্ট, এ্যারোসল উৎপাদন ও অগ্নিনির্বাপন ইত্যাদি।	এইচএফসি, হাইড্রোকার্বন, ন্যাচারাল রিফ্রিজারেন্ট ইত্যাদি।

নির্ঘণ্ট-৪

ওজোনস্তর রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক

১৯২৮	● বিশ্বে প্রথম ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আবিষ্কৃত হয় এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু।
১৯৭০	● বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা ওজোনস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।
১৯৭৪	● শেরউড রোল্যান্ড এবং মারিও মোলিনা বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধে প্রকাশ করেন যে, সিএফসি ওজোনস্তরের ক্ষতি করছে।
১৯৭৭	● ওজোনস্তর সংক্রান্ত ওয়ার্ল্ড প্ল্যান অব অ্যাকশন গৃহীত হয় এবং ইউনেপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ওজোনস্তর মনিটরিং ও গবেষণার জন্য আহ্বান জানায়।
১৯৮৫	● বৃটিশ এন্টার্টিক সার্ভের বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেন, বসন্তকালে এন্টার্টিকার উপরে ওজোন গহ্বর সৃষ্টি হয়। ● ২২ মার্চ ভিয়েনা কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়।
১৯৮৭	● ১৬ সেপ্টেম্বর মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হয় এবং ১৯৯৫ সাল থেকে ঐ দিন আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।
১৯৮৮	● ২২ সেপ্টেম্বর হতে ভিয়েনা কনভেনশন কার্যকর হয়।

১৯৮৯	● ১লা জানুয়ারি থেকে মন্ট্রিল প্রটোকল কার্যকর হয়। ● প্রথম উন্নত দেশগুলোতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়।
১৯৯০	● মন্ট্রিল প্রটোকলের পার্টিসমূহ উন্নয়নশীল দেশে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেয় এবং মাল্টিলেটারেল ফান্ড তৈরি করেন।
১৯৯১	● অন্তবর্তীকালীন মাল্টিলেটারেল ফান্ডের কার্যক্রম শুরু হয়। ● বাস্তবায়নকারী সংস্থা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে।
১৯৯২	● ১৯৯০ সালে গৃহীত লন্ডন সংশোধনী কার্যকর হয়। ● নন-কমপ্লায়েন্স প্রসিডিউর অব দি মট্রিল প্রটোকল কার্যক্রম শুরু হয়।
১৯৯৩	● মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্তবর্তীকালীন মাল্টিলেটারাল ফান্ড বিলুপ্ত হয়।
১৯৯৪	● জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৬ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ● উন্নত দেশ হতে হ্যালন-এর ব্যবহার বন্ধ করা হয়।

১৯৯৫	●	ওজোনস্তর ক্ষয় আবিষ্কারের জন্য শেরউড রোল্যান্ড, মারিও মোলিনা এবং পল ক্রোটজেল রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান।
১৯৯৬	●	উন্নত দেশসমূহ সিএফসি-এর ব্যবহার বন্ধ করে।
১৯৯৯	●	উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়।
২০০৩	●	প্রাক্তন জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান বলেন যে, মন্ট্রিল প্রটোকল এ পর্যন্ত সবচেয়ে সফল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি।
২০০৫	●	উন্নত দেশগুলো মিথাইল ব্রোমাইড ফেজ আউট করে।
২০০৬	●	সবচেয়ে বড় ওজোন হোলের সন্ধান পাওয়া যায় যার গড় আয়তন ২৬.৬ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার।
২০০৭	●	মন্ট্রিল প্রটোকলে মন্ট্রিল সমন্বয়ের মাধ্যমে এইচসিএফসি-এর নিয়ন্ত্রণের সময়সীমা ১০ বছর এগিয়ে আনা হয়।
২০০৮	●	মন্ট্রিল সমন্বয় কার্যকর হয়।
২০০৯	●	ভিয়েনা কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল সার্বজনীন চুক্তি মর্যাদা পায়।
২০১০	●	সকল দেশ সিএফসি, হ্যালন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে।

২০১৩	● উন্নয়নশীল দেশসমূহ প্রথম এইচসিএফসি-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে।
২০১৪	● মন্ট্রিল প্রটোকলের চারটি সংশোধনী সকল সদস্য রাষ্ট্র (১৯৭টি দেশ) অনুস্বাক্ষর করে। ● বিজ্ঞানীরা জানান যে, ওজোনস্তর আগের অবস্থায় ফিরে আসছে।
২০১৫	● উন্নত দেশসমূহ ৯০% এইচসিএফসি-এর ব্যবহার ও উৎপাদন কমিয়ে আনে। ● উন্নয়নশীল দেশসমূহ ১০% এইচসিএফসি-এর ব্যবহার কমিয়ে আনে।
২০১৬	● কিগালি সংশোধন গৃহীত হয়। এতে এইচএফসির ব্যবহার পর্যায় ক্রমে কমিয়ে আনা হবে। ● কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে এই শতাব্দির শেষে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রায় ০.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমিয়ে রাখা সম্ভব হবে।
২০১৯	● ১লা জানুয়ারি ২০১৯ হতে কিগালি সংশোধন কার্যকর হয়।

উৎস: UNEP

প্রকাশনায়
ওজোন সেল
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ভবন, ই-১৬, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
টেলিফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৮১৮০১